কথা বলে বসে, অসঙ্গত আচরণ করে বসে ; তার অনেক প্রত্যাশা অনুচিত বলে মনে হয়, স্বপ্নকল্পনা নিতান্ত অবিবেচনা-প্রসূত মনে হয়। এ সবই তার মধ্যেকার দুই অপুর সংঘর্ষ-মুহূর্তগুলি থেকে উদ্ভূত। আপাত-দৃষ্টিতে তাদের যতই অসঙ্গত বলে মনে হোক না কেন, তাদের মধ্যে কোন মনস্তাত্ত্বিক বা শৈল্পিক অসঙ্গতি নেই।" (তদেব, পৃ. ১-৩)।

নাবালক অপু নিশ্চিন্দিপুরকে ভালোবাসে, কিন্তু তার থেকে সে মুক্তিও চায়। চায় বলেই সে বালো মায়ের সুখের স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে জোর করে ইশকুলে পড়তে গিয়েছিল। দিদি দুর্গাকে সে ভালোবাসত, দুর্গা তার কাছে নিশ্চিন্দিপুরের ফ্রেমে বাঁধা সারা জীবনের স্মৃতি-সঞ্চয়। আর তার মা কেবল মমতাময়ী জননী নয়, গ্রামজননীর প্রতীক হয়ে উঠেছিল। সর্বজয়ার মৃত্যুতে নাবালক অপু দুঃখে ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু সাবালক অপু অনুভব করেছিল বন্ধন থেকে মুক্তির উল্লাস। কিন্তু মুক্তি তখনো আসেনি। অপর্ণা-রূপে এলো বন্ধন। অপর্ণার আকস্মিক মৃত্যুতে অপুর অপরিসীম বেদনা-নৈরাশ্য, তা প্রেমভঙ্গে নয়, কারণ তার সঙ্গে অপুর প্রেমসম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। নাবালক অপু মুক্তি চায়। তা সে পেল অপর্ণা ও লীলার মৃত্যুতে, তার ছেলে কাজলের মধ্যে রেখে গেল অপরাজিত জীবনপ্রবাহকে।

॥ ৫ ॥

'পথের পাঁচালী'-'অপরাজিত'-এর নেপথ্যভূমি 'তৃণাঙ্কুর', 'আরণ্যক'-এর নেপথ্যভূমি 'স্মৃতির রেখা'। বিভূতিভূষণের চতুর্থ উপন্যাস 'আরণ্যক' ( চৈত্র ১৩৪৫, মার্চ ১৯৩৯) রচনার কথা লেখক ভেবেছিলেন ভাগলপুরে থাকাকালীন। ঐ সময় বছর চারেক (১৯২৪-১৯২৮) পাথুরিয়াঘাটা এস্টেটের অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার হিসেবে বিহার রাজ্যের ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলার জঙ্গল-মহাল বিলিব্যবস্থার দায়িত্বে ছিলেন। ইসমাইলপুর ও আজমাবাদের অরণ্য-পরিবেশে বিভূতিভূষণ বাস করেন। এই বিষয়ে তাঁর সংকল্প ও ভাবনা বিভূতিভূষণ লিপিবদ্ধ করেন 'স্মৃতির রেখা'য় ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি।—

"এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো—একটা কঠিন শৌর্যপূর্ণ, গতিশীল, ব্রাত্য জীবনের ছবি। এই বন, নির্জনতা, ঘোড়ায় চড়া। পথ হারানো অন্ধকার—এই নির্জনে জঙ্গলের মধ্যে খুপড়ি বেঁধে থাকা। মাঝে মাঝে, যেমন আজ গভীর বনের নির্জনতা ভেদ করে যে শুঁড়িপথটা ভিটে টোলার বাথানের দিকে চলে গিয়েছে দেখা গেল, ঐ-রকম শুঁড়ি-পথ এক বাথান থেকে আর এক বাথানে যাচ্ছে—পথ হারানো, রাত্রের অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া করে ঘোরা, এদেশে লোকের দাবিদ্র্য, সরলতা, এই verile, active life, সন্ধ্যার অন্ধকারে ভরা গভীর বন ঝাউবনের ছবি—এই সব।" (বিভূতি-রচনাবলী', খণ্ড ১, ১৩৭৭। পৃ. ৪১৭০।

কলকাতার ব্যস্ত জীবন ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছেড়ে তরুণ লেখক বিভূতিভূষণ চলে গিয়েছিলেন বিহারের নির্জন জঙ্গল-মহালে। 'স্মৃতির রেখা' দিনলিপিতে সে-সময়ের অনুভূতি ধরা আছে ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি।—



Scanned with CamScanner

"অভিজ্ঞতায় একটা বুঝলাম, আজ যে স্থানটা নতুন, ভাল লাগে না, মন বসে না। যত দিন যায় তার সঙ্গে স্মৃতির যোগ হতে থাকে, ততই সেটা মধুর হয়ে ওঠে। এই ইসমাইলপুর ১৯২৪ সালে আন্দামান দ্বীপের মতো ঠেকতো। আজমাবাদকে তো মনে হোত (১৯২৫ সালেও) সভ্য জগতের প্রান্তভাগ—জঙ্গলে ভরা বেলজিয়াম কঙ্গোর কোনো নির্জন উপনিবেশ—আজকাল সেই আজমাবাদ, এই ইসমাইলপুর ছেড়ে যেতে হবে ভেবে কষ্ট হচ্ছে।" (তদেব, পৃ. ৪১৩-১৪)।

'আরণ্যক' উপন্যাসের সূচনায় কাহিনীর কথক সত্যচরণ চাকুরি পাওয়ার পরে পৌষ মাসের এক শীত-সন্ধ্যায় বিহারের এক অখ্যাত ছোট রেলস্টেশনে নেমেছিল। সেদিন তার যে নির্জনতাবোধ, তা 'স্মৃতির রেখা'য় লভ্য।

বস্তুত 'আরণ্যক' উপন্যাসের একাধিক বর্ণনা, স্মৃতিচারণা, নিঃসঙ্গ অনুভূতির স্পষ্ট প্রতিরূপ পাওয়া যায় 'স্মৃতির রেখা' দিনলিপিতে। যেমন, 'আরণ্যক' উপন্যাসে সত্যচরণের অতীত স্মৃতিচারণা—

"অতীত কোন দিনে, এই যেখানে বসিয়া আছি, এখানে ছিল মহাসমুদ্র— ঢেউ আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িত ক্যামব্রিয়ান যুগের এই বালুময় তীরে—এখন যাহা বিরাট পর্বতে পরিণত হইয়াছে। এই ঘন অরণ্যানীর মধ্যে বসিয়া অতীত যুগের সেই নীল সমুদ্রের স্বপ্ন দেখিতাম।

পুরো যত্র স্রোক্ত পুলিনমধুনা তত্র সরিতাম্।

এই বালু-প্রান্তরের শৈলচূড়ায় সেই বিস্মৃত অতীতের মহাসমুদ্র বিক্ষুব্ধ উর্মিমালার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে—অতি স্পষ্ট সে চিহ্ন—ভূতত্ত্ববিদ্‌দের চোখে ধরা পড়ে। মানুষ তখন ছিল না। এ ধরনের গাছপালাও ছিল না। যে ধরনের গাছপালা জীবজন্তু ছিল, পাথরের বুকে তারা তাদের ছাঁচ রাখিয়া গিয়াছে। যে কোনো মিউজিয়মে গেলে দেখা যায়।" ('বিভূতি-রচনাবলী', খণ্ড ৫, পহেলা ফাল্গুন ১৭৭, পৃ. ৬৪)।

এর সঙ্গে মিলে যায় ২৯ জুলাই, ১৯২৫ তারিখে কলকাতায় বসে লেখা দিনলিপি ('স্মৃতির রেখা')—

"পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাম্।

প্রাচীনযুগের অধুনাতন লুপ্ত যে মহাসমুদ্র প্রাচীন পৃথিবীর পৃষ্ঠে হাজার হাজার লুপ্ত জন্তু বুকে করে প্রবাহিত হ'ত, সেই প্রাচীন মহাসমুদ্রের তীরে যেন এরা চুপ করে বসে থাকতো। তাদের মাথার উপরকারের নীলআকাশে অহরহ পরিবর্তনশীল মেঘস্তূপের মত চঞ্চল এই বিশ্ব তার প্রাচীন আদিম যুগের লতাপাতা, জীবজন্তু সহ তাদের চারধারে এমনি করেই মায়াপুরী রচনা করে রইত। এমনি প্রভাতে সূর্যের আলো প্রাচীন যুগের সাগর-বেলায় পড়তো। আর প্রভাত সূর্যের আলো এমনই শীকরসিক্ত প্রাচীন ধরনের ঝিনুক শাঁখ কড়ি পলার ওপরে রামধনুর রং ফলাতো। সবসুদ্ধ নিয়ে প্রাচীন মহাসমুদ্রের বেলাভূমি আজকাল অন্ধকার খনি-গর্ভে চুনা-পাথরে রূপান্তরিত হয়ে আছে। মহাকালের গহন-গভীর রহস্যে নৃত্য-ক্ষুব্ধ চরণচিহ্নের মত।" ('বিভূতি-রচনাবলী', খণ্ড ১, পৃ. ৩৫৯-৩৬০)।

'আরণ্যক' উপন্যাস নানাদিক থেকে লেখকের সাহিত্যবোধ তথা জীবনবোধের পূর্ণতা প্রাপ্তিতে সহায়ক হয়ে উঠেছে। 'পথের পাঁচালী'র নিসর্গ গ্রাম-প্রকৃতি, তা রোমান্টিক, তা



Scanned with CamScanner

শিশু-কিশোরের মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখা। 'আরণ্যক'-এর প্রকৃতি বস্তুনিষ্ঠ, মানবিক আবেদন-মুক্ত, রুক্ষ, ভয়াল, নির্মম প্রকৃতি, তা মানুষের সুখদুঃখে উদাসীন—ভারতের প্রকৃতির অপর রূপটা এই উপন্যাসে যুবক অপুর দৃষ্টিতে উন্মোচিত। দুয়ে মিলে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-দৃষ্টি পূর্ণতায় উপনীত। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-চেতনার কথা বলতে গেলে 'পথের পাঁচালী'র গ্রামবাংলার সবুজ ঘরোয়া রোমান্টিক প্রকৃতির সঙ্গে বিহারের পাহাড় ও ঘন জঙ্গলের ভয়াল প্রকৃতির কথাও বলতে হবে। দুয়ে মিলে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-চেতনা সম্পূর্ণতায় উপনীত।

বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-চেতনায় এই দুই স্তর। একটা থেকে আর একটায় তিনি আকস্মিকভাবে উপনীত হননি। 'পথের পাঁচালী'র (১৯২৯) পর 'অপরাজিত' (১৯৩২), মাঝে 'দৃষ্টিপ্রদীপ' (১৯৩৫), তারপর 'আরণ্যক' (১৯৩৯)।

'পথের পাঁচালী'র নিসর্গ দক্ষিণ বাংলার শ্যামল শান্ত নিসর্গ। ইতঃমধ্যেই একাধিকবার আমরা তার ছবি দেখেছি। 'অপরাজিত' (২য় খণ্ড)-এ আর-এক নিসর্গের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সাবালক অপুর দৃষ্টিতে— নাগপুরের কাছে বন-অরণ্য-পাহাড়ের উদ্ধত গম্ভীর ভয়াল সৌন্দর্য।

"অপুর বাংলো-ঘরের পিছনে ও দক্ষিণে পাহাড়, পিছনকার পাহাড়তলী আধমাইলের কম, দক্ষিণের পাহাড় মাইল দুই দূরে। সামনের বহুদূর বিস্তৃত উঁচু নীল জমিটা শাল ও পপরেল চারা ও একপ্রকার অর্ধশুষ্ক তৃণে ভরা—অনেক দূর পর্যন্ত খোলা। সারা পশ্চিম দিকচক্রবাল জুড়িয়া বহুদূরে, বিন্ধ্য পর্বতের নীল অস্পষ্ট সীমারেখা, ছিন্দওয়ারা ও মহাদেও শৈলশ্রেণী—পশ্চিমাবাতাসের ধূলা-বালি যেদিন আকাশকে আবৃত না করে সেদিন বড় সুন্দর দেখায়। ... দক্ষিণে পার্বতসানুর ঘন বন নিবিড়, জনমানবহীন,রুক্ষ ও গম্ভীর। দিনের শেষে পশ্চিম গগন হইতে অস্ত-সূর্যের আলো পড়িয়া পিছনের পাহাড়ের যে অংশটা খাড়া ও অনাবৃত, তাহার গ্রানাইট দেওয়ালটা প্রথমে হয় হলদে, পরে হয় মেটে সিঁদুরের রং, পরে জরদা রঙের হইতে হইতে হঠাৎ ধূসর ও তারপরেই কালো হইয়া যায়। ওদিকে দিগন্তলক্ষ্মীর ললাটে আলোর টিপের মত সন্ধ্যাতারা ফুটিয়া ওঠে, অরণ্যানী ঘন অন্ধকারে ভরিয়া যায়, শাল ও পাহাড়ী বাঁশের ডালপালায় বাতাস লাগিয়া একপ্রকার শব্দ হয়— রামচরিত ও জঙ্গরী সিং নেকড়ে বাঘের ভয়ে আগুন জ্বালে, চারিধারে শিয়াল ডাকিতে শুরু করে, বনমোরগ ডাকে, অন্ধকার আকাশে দেখিতে দেখিতে গ্রহ, তারা, জ্যোতিষ্ক, ছায়াপথ একে একে দেখা দেয়। পৃথিবী,আকাশবাতাস অপূর্ব রহস্যভরা নিস্তব্ধতায় ভরিয়া আসে, তাঁবুর পাশের দীর্ঘ ঘাসের বন দুলাইয়া এক এক দিন বন্যবরাহ পলাইয়া যায়, দূরের কোথায় হায়েনা উন্মাদের মত হাসিয়া উঠে, গভীর রাত্রে কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ পাহাড়ের পিছন হইতে ধীরে ধীরে উঠিতে থাকে, এ যেন সত্যই গল্পের-বইয়ে-পড়া জীবন।" ('অপরাজিত', ২য় খণ্ড/পরিচ্ছেদ এক, 'বিভূতি-রচনাবলী', খণ্ড ৩, আশ্বিন ১৩৭৭, পৃ. ৮০)।

'অপরাজিত'-এর নায়ক অপূর্ব ড্রিলিং ইনস্‌পেক্টর, মধ্যপ্রদেশের ঘন জঙ্গলে তার কর্মস্থল। 'আরণ্যক'-এর কথক (সে তো নায়ক নয়) সত্যচরণ বিহারের ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলায় জঙ্গল-মহালের বন্দোবস্তকারী, কলকাতার খেলাত ঘোষ এস্টেটের ভাগলপুরস্থিত



Scanned with CamScanner

অফিসের অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার। তার কাজ জঙ্গল-নিধন। সর্বোচ্চ নীলাম-ডাকওয়ালাকে বিশ-ত্রিশ হাজার বিঘা জমির বন্দোবস্ত দেওয়া—যেখানে জঙ্গল কেটে চাষবাস হবে, সেই কাজে আসবে অনেক মজুর, গড়ে উঠবে কুৎসিত ধাওড়া, নষ্ট হয়ে যাবে অপূর্ব বনশ্রী। 'আরণ্যক' উপন্যাসে কেবল ভয়াল উদ্ধত রুক্ষ প্রকৃতি নেই, সেইসঙ্গে আছে নানা ধরনের মানুষ ঃ শান্ত ভীরু গরীব নির্লোভ গাঙ্গোতা প্রজা এবং হিংস্র নিষ্ঠুর ছত্রি ও রাজপুত কুসিদজীবী মহাজন ও ধনী চাষী। সত্যচরণ 'আরণ্যক'-এর বিমুগ্ধ নিষ্ক্রিয় দর্শক, জমিদারের আদেশে অরণ্যহত্যার এজেন্ট। দিগন্তলীন মহালিখারূপের পাহাড় ও মোহনপুরা অরণ্যানী পটভূমিতে নাঢ়া-বইহার ও লবটুলিয়ার অরণ্য-প্রান্তর বিনষ্ট করে বসতিস্থাপনের কাজটি সত্যচরণের হাতেই নিষ্পন্ন হয়েছিল। তবু এই আরণ্য-প্রকৃতিকে সত্যচরণ ভালোবেসেছে, সেইসঙ্গে তার মনের মণিকোঠায় সাজানো আছে বহু চরিত্র—এরাই 'আরণ্যক'-এর যথার্থ 'অরণ্যসন্তান'—ভানুমতী, মঞ্চী, সুরতিয়া, কুন্তা, মটুকনাথ, যুগলপ্রসাদ, রাজু পাঁড়ে, ধ্রুবা, দোবরু পান্না, নাটুয়া দশরথ, সুজন সিং।

'আরণ্যক'-এর প্রকৃতির দুই রূপ সত্যচরণকে মুগ্ধ করেছে। তেমন দুটির উদাহণ দিই।—

ক. "কারো নদীতে পৌঁছিবার কিছু পূর্বেই টক্‌টকে লাল সুবৃহৎ সূর্যটা পশ্চিম দিকচক্রবালে একটা অনুচ্চ শৈলমালার পিছনে অস্ত গেল। কারো নদীর তীরের বালিয়াড়ির উপর যখন ঘোড়াসুদ্ধ উঠিয়াছি, এইবার এখান হইতে ঢালু বালির পথে নদীগর্ভে নামিব—হঠাৎ সেই সূর্যাস্তের দৃশ্য এবং ঠিক পূর্বে বহু দূরে কৃষ্ণরেখার মত পরিদৃশ্যমান মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের মাথায় নবোদিত পূর্ণচন্দ্রের দৃশ্য—যুগপৎ এই অস্ত ও উদয়ের দৃশ্যে থমকিয়া ঘোড়াকে লাগাম কষিয়া দাঁড় করাইলাম। সেই নির্জন অপরিচিত নদীতীরে সমস্তই যেন একটা অবাস্তব ব্যাপারের মত দেখাইতেছে—

পথে সর্বত্র পাহাড়ের ঢালুতে ও ডাঙায় ছাড়া-ছাড়া জঙ্গল, মাঝে মাঝে সরু পথটাকে যেন দুই দিক হইতে চাপিয়া ধরিতেছে, আবার কোথাও কিছুদূর সরিয়া যাইতেছে। কি ভয়ঙ্কর নির্জন চারিদিক, দিনমানে যা-হয় একরূপ ছিল, জ্যোৎস্না উঠিবার পর মনে হইতেছে যেন অজানা ও অদ্ভুত সৌন্দর্যময় পরীরাজ্যের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। .. (বাঘ-ভালুকের) ভয়ের অনুভূতি চারি পাশের সৌন্দর্যকে যেন আরও বাড়াইয়া তুলিল। এক এক স্থানে পথ দক্ষিণ হইতে খাড়া উত্তরে ও উত্তর হইতে পূর্বে ঘুরিয়া গিয়াছে, পথের খুব কাছে বাম দিকে সর্বত্রই একটানা অনুচ্চ শৈলমালা, তাদের ঢালুতে গোলগোলি ও পলাশের জঙ্গল, উপরের দিকে শাল ও বড় বড় গাছ। জ্যোৎস্না এবার ফুটফুট করিতেছে, গাছের ছায়া হ্রস্বতম হইয়া উঠিয়াছে, কি একটা বন্য-ফুলের সুবাসে জ্যোৎস্নাশুভ্র প্রান্তর ভরপুর, অনেক দূরে পাহাড়ে সাঁওতালেরা জুম চাষের জন্য আগুন দিয়াছে, সে কি অভিনব দৃশ্য, মনে হইতেছে পাহাড়ে আলোর মালা কে যেন সাজাইয়া রাখিয়াছে।" ('আরণ্যক', পরিচ্ছেদ ৩, 'বিভূতি-রচনাবলী', খণ্ড ৫, ১৩৭৭, পৃ. ৪৬-৪৭)।

খ. "বড় ভাল লাগে এ-অঞ্চলের মেয়েদের মুখে এই হিন্দীর টানটি। নিজে ভাল হিন্দী বলিতে পারি না বলিয়া আমার কথ্য হিন্দীর প্রতি বেজায় আকর্ষণ। বইয়ের হিন্দী নয়—এইসব পল্লীপ্রান্তে, পাহাড়তলীতে, বনদেশের মধ্যে, বিস্তীর্ণ শ্যামল যব গম ক্ষেতের পাশে চলনশীল চামড়ার রহট যেখানে মহিষের দ্বারা ঘূর্ণিত হইয়া খেতে খেতে জল-সেচন



Scanned with CamScanner

করিতেছে, অস্তসূর্যের ছায়াভরা অপরাহ্ণে দূরের নীলাভ শৈলশ্রেণীর দিকে উড়ন্ত বালিহাঁস বা ঝিল্লী বা বকের দল যেখানে একটা দূরবিসর্পী ভূপৃষ্ঠের আভাস বহন করিয়া আনে—সেখানকার সে হঠাৎ-শেষ হইয়া-যাওয়া, কেমন যেন আধ-আধ, ভাঙা-ভাঙা ক্রিয়াপদযুক্ত এক ধরনের ভাষা, যাহা বিশেষ করিয়া মেয়েদের মুখে সাধারণত শোনা যায়—তাহার প্রতি আমার টান খুব বেশী।" ('আরণ্যক', পরিচ্ছেদ ১২, তদেব, পৃ. ১৩৩-১৩৪)।

'আরণ্যক' উপন্যাসের নিসর্গ আর মানুষের এই অমেয় ঐশ্বর্য লেখককে আবিষ্ট করেছে। সারা উপন্যাসে তার পরিচয় ছড়ানো আছে। 'আরণ্যক'-এ কেবল নিসর্গ নয়, মানুষকেও দেখেছেন। আর সেইসঙ্গে অনুভব করেছেন ঐশী মহিমা। আধুনিককালের পাঠকের পছন্দ হোক আর না হোক, মানুষ-প্রকৃতি-ঈশ্বর—তিনে মিলে বিভূতিভূষণের সাহিত্যলোক গড়ে উঠেছে। 'আরণ্যক' তার ব্যতিক্রম নয়।

'আরণ্যকে'র নিসর্গ যে 'পথের পাঁচালী'র নিসর্গ থেকে ভিন্নতর, সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। আরো দুয়েকটি উদাহরণে তা বোঝা যায়।

১. যাইতে যাইতে তাহার মন পুলকে ভরিয়া উঠিতেছিল। সে কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারে না যে, সে কী ভালবাসে এই মাটির তাজা রোদেপড়া গন্ধটা, এই ছায়াভরা দূর্বাঘাস, সূর্যের আলো-মাখানো মাঠ, পথ, গাছপালা, পাখী, বনঝোপ, ঐ দোলানো ফুলফলের খোলো, আলকুশী, বনকলমী,নীল অপরাজিতা। ঘরে থাকিতে তার মোটেই ইচ্ছা হয় না; ভারী মজা হয় যদি বাবা তাহাকে বলে— খোকা তুমি শুধু পথে পথে বেড়িয়ে বেড়াও—তাহা হইতে এইরকম বনফুল ঝুলানো ছায়াচ্ছন্ন ঝোপের তলা দিয়া ঘুঘু-ডাকা দূরবনের দিকে চোখ রাখিয়া এইরকম মাটির পথটি বাহিয়া শুধুই হাঁটে—শুধুই হাঁটে। ('পথের পাঁচালী', 'বিভূতি-রচনাবলী', খণ্ড ১)।

২. দিকচক্রবেলা দীর্ঘ নীলরেখার মত পরিদৃশ্যমান এই পাহাড় ও বন দুপুরে, বিকালে, সন্ধ্যায় কত স্বপ্ন আনে মনে।... এর জ্যোৎস্না, এর নির্জনতা, এর নীরব রহস্য, এর সৌন্দর্য, এর মানুষজন, পাখির ডাক, বন্য ফুলশোভা— সবই মনে হয় অদ্ভুত। মনে এমন এক গভীর শান্তি ও আনন্দ আনিয়া দেয়, জীবনে যাহা কখনো কোথাও পাই নাই। তার উপরে বেশি করিয়া অদ্ভুত লাগে ওই মহালিখারূপের শৈলমালা ও মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের সীমারেখা। কী রূপলোক যে ইহারা ফুটাইয়া তোলে দুপুরে, বিকালে, জ্যোৎস্নারাত্রে কি উদাস চিন্তার সৃষ্টি করে মনে। ('আরণ্যক', 'বিভূতি-রচনাবলী', খণ্ড ৫)।

॥ ৬ ॥

'আরণ্যক' শব্দের একাধিক অর্থ আছে। এক অর্থে, 'যাহারা অরণ্যবাসী', অপর অর্থে 'উপনিষদ'—যা অরণ্যে লিখিত। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসে দুটিই পরিস্ফুট। অরণ্যবাসী সরল মানুষদের জীবন-কাহিনী এখানে পাই। আবার, উপনিষদের উদার গম্ভীর মহিমা, ঐশী বন্দনা, বিশ্বের মহান আলেখ্যও আছে।

'আরণ্যক' উপন্যাস সম্পর্কে কয়েকটি ব্যাসকূটের আলোচনা পাঠকের প্রত্যাশিত হতে



Scanned with CamScanner

পারে। 'আরণ্যক' কি আধুনিক? এই উপন্যাসের কথক সত্যচরণ বারবার জানিয়েছে চাকুরি নিয়েই সে জঙ্গল-মহালে এসেছে। বিশ-ত্রিশ হাজার বিঘা বিলি-বন্দোবস্ত করাই তার কাজ। সর্বোচ্চ মূল্যদাতা এখানকার আরণ্যশোভা নষ্ট করে গম-জোয়ার-সরিষার চাষ করবে, শস্য তোলার জন্যে আসবে কয়েক মাসের জন্য হাজার হাজার মজুর, তাদের বস্তি-ঝুপড়ি-জীবনযাত্রায় আরণ্যসৌন্দর্য নষ্ট হবে, শস্য তোলা শেষ হলে তারা চলে যাবে। মানুষের হাতেই প্রকৃতির বিনাশ। সভ্যতা যতই অগ্রসর হয় প্রকৃতি ততই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এই সামাজিক-আর্থনীতিক সত্য এখানে প্রতিষ্ঠিত। সত্যচরণের সামনে দু ধরনের মানুষ। যুগলপ্রসাদের মতো অরণ্যপ্রেমিক পুষ্পপ্রেমিককে সে দেখেছে (অষ্টম পরিচ্ছেদ, তৃতীয় পর্ব), তার সঙ্গে সত্যচরণের মনের মিল হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের পুষ্পপ্রেমী আরণ্যক মুষ্টিমেয়। বাকিদের মধ্যে আছে দেবী সিং, ছট্টু সিং, রাসবিহারী সিং, নন্দলাল ওঝার মতো স্বার্থপর কুসিদজীবী ও প্রতিপত্তিশালী অত্যাচারী মহাজন, যারা জমিবিলি থেকে মুনাফা করতে চায়।

সত্যচরণ যে কাজে এসেছিল চার বছরে সে কাজ শেষ হয়েছে। এবার তার বিদায় নেবার পালা। বস্তুত তারই হাত দিয়ে এই বিপুল বনশ্রী ধ্বংস হয়েছে। এখন অবশিষ্ট আছে—সরস্বতী কুণ্ডী ও মহালিখারূপের পাহাড়। সেটুকু রক্ষার জন্য তার মন ঝুঁকেছে, বিপরীতদিকে জমিবিলির হুকুম-মানার কর্তব্যবোধ তাকে বিচলিত করেছে। সত্যচরণ মারফৎ যে আগন্তুক মানুষগুলি বসতি করেছে, তারা এসেছে জীবিকার সন্ধানে, তারা "গাছপালার সৌন্দর্য বোঝে না, বন্য ভূমিশ্রীর মহিমা দেখিবার চোখ নাই, তাহারা জানে পশুর মতো পেটে খাইয়া জীবনযাপন করিতে।" এদের প্রতি সত্যচরণের মমতার সঙ্গে তার অরণ্যপ্রেমের কোনো যোগ নেই। এদেরকে সে আলাদা করে দেখেছে। এই সুন্দর জঙ্গলমহালের বিনষ্টি ঘটিল তারই হাতে, সে মালিকের হুকুমের দাস মাত্র। এই বেদনা সত্যচরণকে পীড়া দিলেও সে জানে যে, এটা অনিবার্য। সেইসঙ্গেই তার মনে হয় বিদায়বেলায়—'দেশে চলিয়াছি। কতকাল পরে এ নির্জনবাস হইতে মুক্তি পাইব।' অরণ্যশ্রী নষ্ট করার জন্যে তার মনে আক্ষেপ আছে, সেইসঙ্গে এর অনিবার্যতা, আর শহরজীবনে ফিরে যাবার সম্ভাবনায় এক ধরনের মুক্তিবোধ। মানুষের হাতে প্রকৃতির বিনষ্টিতে সত্যচরণের দুঃখবোধ সত্ত্বেও অবশ্যস্বীকার্য, মানবসভ্যতার অগ্রগতির এটা এক অনিবার্য সমস্যা, যা আজকের ভারতে আমরা বার বার দেখি। নর্মদা-পরিকল্পনা নিয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে 'নর্মদা বাঁচাও'-পন্থীদের বিরোধ এরই পরিচায়ক। লেখক এই সত্যকে এখানে স্পষ্টরূপে উপস্থিত করেছেন। এটাই এই উপন্যাসের আধুনিকতা।

'আরণ্যক' উপন্যাসের নায়িকা প্রকৃতি— সে ভয়ালসুন্দর, মানুষের সুখদুঃখে উদাসীন, মানুষের জীবনে সে ঘরোয়া রূপে দেখা দেয় না। এই নায়িকার (প্রকৃতি) বর্ণনায় সত্যচরণ ক্লান্তিহীন। উপনিষদের রহস্য, গাম্ভীর্য, মহান সমুন্নতি, ঐশী উপস্থিতি ও অমেয় সৌন্দর্য লেখক আবিষ্কার করেছিলেন এই আরণ্য-প্রকৃতিতে। তার একটিমাত্র পরিচায়ক-অংশ এখানে উদ্ধার করি—

'রাত্রি গভীর। একা প্রান্তর বাহিয়া আসিতেছি। জ্যোৎস্না অস্ত গিয়াছে। কোনদিকে আলো দেখা যায় না, এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা—এ যেন পৃথিবী হইতে জনহীন কোন অজানা গ্রহলোকে



Scanned with CamScanner

নির্বাসিত হইয়াছি—দিগন্তরেখায় জ্বলজ্বলে বৃশ্চিকরাশি উদিত হইতেছে, মাথার উপরে অন্ধকার আকাশে অগণিত দ্যুতিলোক, নিম্নে লবটুলিয়া বইহারের নিস্তব্ধ অরণ্য, ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে পাতলা অন্ধকারে বনঝাউয়ের শীর্ষ দেখা যাইতেছে—দূর কোথায় শিয়ালের দল প্রহর ঘোষণা করিল—আরও দূরে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের সীমারেখা অন্ধকারে দীর্ঘ কালো পাহাড়ের মত দেখাইতেছে—অন্য কোন শব্দ নাই, কেবল একধরনের পতঙ্গের একঘেয়ে একটানা কি-র-র্-র্ শব্দ ছাড়া; কান পাতিয়া ভাল করিয়া শুনিলে ঐ শব্দের সঙ্গে মিশানো আরও দু-তিনটি পতঙ্গের আওয়াজ শোনা যাইবে। কি অদ্ভুত রোমান্স এই মুক্ত জীবনে, প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ নিবিড় পরিচয়ে সে কি আনন্দ! সকলের উপর কি একটা অনির্দেশ্য, অব্যক্ত রহস্য মাখানো— কি সে রহস্য জানি না — কিন্তু বেশ জানি সেখান হইতে চলিয়া আসিবার পরে আর কখনও সে রহস্যের ভাব মনে আসে নাই।' ('বিভূতি-রচনাবলী', খণ্ড ৫, ফাল্গুন ১৩৭৭। 'আরণ্যক', ১২/১, পৃ. ১২৭৪)।

'আরণ্যক' উপন্যাসের নায়ক কে? আদৌ কেউ আছে? অনেকে বলেন নাই, অনেকে বলেন, সত্যচরণই নায়ক। আমাদের প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয়, সত্যচরণের নায়ক হবার যোগ্যতা নেই— সে তো জঙ্গল-মহাল ইজারা-দেবার হুকুম তামিলকারী মাত্র। তবে সে কি কাহিনীর নিষ্ক্রিয় দর্শক ও সংযোগরক্ষকমাত্র? তাও নয়। তাকে নিষ্ক্রিয় চরিত্র (Passive character) মনে করা ভুল। কারণ উপন্যাসে মাঝে মাঝেই তাঁর সক্রিয়তার পরিচয় আমরা পাই। রাজু পাঁড়ে, মটুকনাথ, গিরধারীলাল, কুন্তাকে ম্যানজারবাবুরূপে সে দিয়েছে আশ্রয় ও নির্ভরতা, তাদের একটা স্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। এটা ম্যানেজার হিসাবে তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত। এস্টেটের প্রয়োজনে সে ব্যক্তিগত দায়িত্বে ধাউতাল সাহুর কাছে ঋণ নিয়েছে। রাখালবাবুর বিধবা স্ত্রীকে এস্টেট থেকে মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কাছারির কর্মচারীদের সতর্কবাণী উপেক্ষা করে দুর্দান্ত রাজপুত রাসবিহারী সিংয়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেছে। অপরদিকে ছট্টু সিং, নন্দলাল ও তার মতো অত্যাচারী রাজপুতদের হাত থেকে দুর্বল নিরীহ, গাঙ্গোতা প্রজাদের রক্ষা করেছে, দাঙ্গা বন্ধ করেছে। উপন্যাসের শেষদিকে সে হয়ে উঠেছে সক্রিয় চরিত্র। (দ্রষ্টব্য—'আরণ্যক : অরণ্যের ঐকতান'—কাননবিহারী গোস্বামী, 'বিভূতিভূষণ : বিচার ও বিশ্লেষণ')।

'আরণ্যক' কি উপন্যাস? যদি তা হয়, তবে তার প্রকৃতি কী? এ বিষয়ে লেখকের নিজের ছোট্ট ভূমিকাটি স্মরণযোগ্য।—"মানুষের বসতির পাশে কোথাও নিবিড় অরণ্য নাই। অরণ্য আছে দূরদেশে, যেখানে পতিত পক্ক জম্বুফলের গন্ধে গোদাবরীতীরের বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। 'আরণ্যক' সেই কল্পনালোকের বিবরণ। ইহা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে—ইহা উপন্যাস। অভিধানে লেখে 'উপন্যাস' মানে বানানো গল্প। অভিধানকার পণ্ডিতদের কথা আমরা মানিয়া লইতে বাধ্য। তবে 'আরণ্যক'-এর পটভূমি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। কুশী নদীর অপর পারে এরূপ দিগন্ত-বিস্তীর্ণ অরণ্যপ্রান্তর পূর্বে ছিল, এখনও আছে। দক্ষিণ ভাগলপুর ও গয়া জেলার বন পাহাড় তো বিখ্যাত।"

লেখকের এই কৈফিয়ৎ অগ্রাহ্য করার তেমন কোনো কারণ দেখি না। কলকাতার এক শিক্ষিত বেকার যুবক সত্যচরণ তার এক ধনী বন্ধুর অনুরোধে হঠাৎই তার সম্পূর্ণ



Scanned with CamScanner

অজানা জঙ্গল-মহালে জমিবিলির ম্যানেজারের দায়িত্ব নিয়ে ভাগলপুরে যায়। সেটাই তার সেখানকার হেড-অফিস। সেখান থেকে তাকে বারেবারেই চলে যেতে হয় ভাগলপুর-পূর্ণিয়া জেলার গভীর অরণ্যাঞ্চলে বিশ তিরিশ হাজার বিঘা জমিবিলির বন্দোবস্ত করতে। বছর চারেক যাবৎ এই দায়িত্ব পালন করে কাজ শেষ করে সে কলকাতায় ফিরে আসে। প্রথম প্রথম তার খুব একা লাগত। শেষে জঙ্গলের মায়ায় সে জড়িয়ে পড়ে—অরণ্যের অপার্থিব সৌন্দর্যরহস্যময় চিরন্তন সত্তার সঙ্গে একাত্ম অনুভব করে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সে কলকাতায় ফিরে আসে। —'আরণ্যক'-এর কাহিনীর এটাই মূল কাঠামো। সত্যচরণ কেবল প্রকৃতিমুগ্ধ হয়নি, সেইসঙ্গে বিচিত্র মানুষকেও দেখেছে, মুগ্ধ হয়েছে। তার ভূমিকা অনেকটা সূত্রধার কথকের মতো। তার অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি যতই প্রসারিত হয়েছে, উপন্যাসের প্লট ততই প্রসারিত। সুতরাং তা সত্যচরণের অভিজ্ঞতার পথরেখা ধরে রৈখিক (linear)। উপন্যাসের এই রৈখিক-প্লটের বিশিষ্টতা মনে রাখলে এটি উপন্যাস কিনা তা নিয়ে বিভ্রান্তি ঘটবে না। 'আরণ্যক'-এর প্লট যে বৃত্তাকার নয়, নাট্যরীতির নয়, ক্রমপ্রসারমান প্রাঙ্-নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রগতিসম্পন্ন প্লট নয়, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আরিস্ততল-কথিত প্লট বা বঙ্কিমচন্দ্র-রূপায়িত প্লটের কথা এখানে ওঠে না। কেউ বলেছেন, এটি উপন্যাস নয়, কারণ জীবন-সমালোচনা, সমস্যা-সংঘাত, চরিত্র-বিশ্লেষণ—কিছুই নেই। আবার কেউ বলেছেন, আত্মস্মৃতিমূলক উপন্যাস। এই দুই অভিমতই অগ্রাহ্য। তার কারণ, এতে আছে জীবনসমালোচনা (শহরজীবন ও অরণ্যজীবনের তুলনা, শহরবাসী ও আরণ্যকের মানসিকতার বিচার), আছে ঘটনা-সংঘাত (মহাজনদের সঙ্গে গাঙ্গোতা প্রজাদের দাঙ্গা), আছে কঠিন জীবনযাপনের বিচিত্রকাহিনী, আছে বিচিত্র মানুষের মিছিল, আছে তাদের অনেকের চরিত্র-বিশ্লেষণ। 'আরণ্যক' আত্মস্মৃতিমূলক উপন্যাস নয়, কারণ এর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' বা রমাঁ রলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ'-এর কোনো সাদৃশ্য নেই। আসল কথা, 'আরণ্যক' রূপের বিচারে একাধারে 'Novel of loose plot' এবং 'episodic novel'। তাকে ধারণ করে আছে কথক সত্যচরণ। (দ্র.—তদ্দেব)। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমতই গ্রহণযোগ্য—"আরণ্যক উপন্যাসটির পরিকল্পনার অভিনবত্ব বিস্ময়কর—ইহা সাধারণ উপন্যাস হইতে সম্পূর্ণ নূতন প্রকৃতির। ... প্রকৃতির সহিত মানবমনের এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কাহিনী বাঙলা উপন্যাসে ত নাই-ই ; ইউরোপীয় উপন্যাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত সুলভ নহে।" ('বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৬৯, পৃ. ৫৯৭-৫৯৮)।

'আরণ্যক' উপন্যাসের আলোচনায় আর-একটি মাত্র প্রসঙ্গ উত্থাপন করি। আমার বিবেচনায় এটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। মৃত আদিবাসী রাজা দোবরু পান্নার এককালে রাজত্ব ছিল ধনঝরি শৈলমালার সানুদেশে। তারই বংশধর যুবতী ভানুমতী। এখন তারা নিতান্ত গরীব। তাদের সঙ্গে সত্যচরণের আকস্মিকভাবে আলাপ হয়েছিল। জঙ্গল-মহাল থেকে বিদায়ের পূর্বে সে চকমকিটোলায় শেষবারের মতো তাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। ভানুমতীর সঙ্গে গিয়ে তার পিতৃপুরুষ রাজা দোবরু পান্নার শিলা-কবরে ছাতিমফুল ছড়িয়ে দিয়ে সত্যচরণ তার শ্রদ্ধা নিবেদন করে ফিরে আসার পূর্বে ভানুমতীদের খড়োচালের বাড়িতে এক রাত কাটায়। রাতে বসে সত্যচরণ ভানুমতীর সঙ্গে গল্প করছে। ভানুমতীর



Scanned with CamScanner

পৃথিবী কতটুকু তা জানতে তার ইচ্ছে হল। কোনো শহর সে দেখেছে কিনা, এ প্রশ্নের উত্তরে ভানুমতী জানিয়েছে, দেখেনি, তবে কয়েকটি নাম শুনেছে—গয়া, মুঙ্গের, পাটনা, কলকাতা। সত্যচরণ তাকে শেষ প্রশ্ন করেছে—"আমরা যে দেশে বাস করি তার নাম জান?'

—'আমরা গয়া জেলায় বাস করি।'—'ভারতবর্ষের নাম শুনেছ?'

ভানুমতী মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে শোনে নাই। কখনও কোথাও যায় নাই চক্‌মকিটোলা ছাড়িয়া। ভারতবর্ষ কোনদিকে?" (বিভূতি-রচনাবলী', খণ্ড ৫, ১৩৭৭, ১৮/১, পৃ. ১৯০)।

'আরণ্যক' উপন্যাসে (১৯৩৯/ চৈত্র ১৩৪৫) বিভূতিভূষণ ভানুমতীর এই প্রশ্ন তুলে ধরেছেন উপন্যাসের শেষাংশে : 'ভারতবর্ষ কোন্‌দিকে?'

আজও ভারতের বহুগ্রামে অরণ্যে পর্বত-সানুদেশে বহু আদিবাসী মানুষ আছে, যারা ভারতবর্ষের নাম জানে না, সে-দেশ কোনদিকে তা জানে না। 'আরণ্যক'-এর লেখক বাষট্টি বছর পূর্বে আমাদের এই বিশাল প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এখানেই 'আরণ্যক' উপন্যাস ও তার লেখকের মাহাত্ম্য।

॥ ৭ ॥

'ইছামতী' বিভূতিভূষণের শেষ উপন্যাস। তাঁর মৃত্যুর দশ মাস পূর্বে ( পৌষ ১৩৫৩, জানুয়ারি ১৯৫০) প্রকাশিত হয়। এটির জন্য তিনি মরণোত্তর 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পান। এটি লেখার জন্য তিনি মনে মনে অনেক বছর যাবৎ নিজেকে তৈরি করছিলেন। তাঁর প্রথম দিনলিপি 'স্মৃতির রেখা'য় তাঁর এই সংকল্প লিপিবদ্ধ আছে। ১৯২৮-এ যা সংকল্পিত, তা শেষ পর্যন্ত ১৯৪৬-৪৭-এ বাস্তবে এলো, ১৯৫০-এ প্রকাশিত হল। 'বিভূতি-রচনাবলী'র ১২শ খণ্ডের (১৩৭৯) গ্রন্থ-পরিচয়ে লেখকের এই সংকল্পের বহু উল্লেখ তাঁর দিনলিপি থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। তার যৎসামান্য এখানে উদ্ধার করি। তা থেকে অনুধাবন করা যাবে, বাইশ বছর পূর্ব থেকে লেখক এই উপন্যাসটি লেখার পরিকল্পনা করছিলেন। প্রসঙ্গতউল্লেখ্য, এই উপন্যাসের কালগত বিস্তার উনবিংশ শতাব্দের শেষার্ধের ষোল বছর (১৮৬৩-১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দ / ১২৭৫-১২৮৬ বঙ্গাব্দ)। তখন অখণ্ড বঙ্গে নীলকুঠির সাহেবদের প্রতাপ ছিল। বিভূতিভূষণ যে 'পথের পাঁচালী' রচনার সময় থেকেই 'ইছামতী' রচনার পরিকল্পনা করছিলেন, তার সামান্য পরিচয় উদ্ধার করি।—

ক. "কলবলিয়াতে স্নান করতে এলাম। ঠাণ্ডা জলে নাইতে নাইতে ভাবছিলাম—ঐ আমাদের গ্রামের ইছামতী নদী। আমি একটা ছবি বেশ মনে করতে পারি—এই রকম ধূ ধূ বালিয়াড়ী, পাহাড় নয়, শান্ত, ছোট, স্নিগ্ধ ইছামতীর দু'পাড় ভ'রে ঝোপে ঝোপে কত বনকুসুম, কত ফুলে ভরা ঘেঁটুবন, গাছপালা, গাঙশালিকের বাসা, সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠ। গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামের ঘাট,আকন্দ ফুল। গত পাঁচশত বৎসর ধ'রে কত ফুল ঝ'রে পড়ছে—কত পাখী কত বনঝোপ আসছে যাচ্ছে। স্নিগ্ধ পাটা-শেওলার গন্ধ বার হয়,



Scanned with CamScanner